নফসের চাহিদা

মাওলানা আসেম ওমর হাফিজাহুল্লাহ

নফসের চাহিদা

মাওলানা আসেম ওমর হাফিজাহুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার জন্য নিবেদিত, যার কুদরতের হাতে সবকিছুর রাজত্ব ও সবকিছুই তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আর তিনি যাকে হিদায়াত দিবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারবেন না।

আমরা আর ও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদুর রাসুল (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। যাকে আল্লাহ তায়াল হিদায়াতনামা ও তলোয়ার সহকারে প্রেরন করেছেন মানবজাতির মুক্তির জন্য ।

বর্তমান যুগে মানুষ অতিমাত্রায় নফসের চাহিদা পূর্ণ করতে বিভোর। আমরা নিজের অজান্তেই নিজের নফসকে ইলাহ বানিয়ে বসে আছি। যেমনটি আল্লাহ সুবাহানাহু তা'য়ালা বলেন,,,,

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"।, সূরা আল কাসাস ৫০

তাই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আন নাসর মিডিয়া প্রকাশিত শায়েখে মুহতারাম মাওলানা আসেম ওমর হাফিজাহুল্লাহ এর অডিও লেকচার 'নফসের চাহিদা'।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের সবাইকে নফসের অনিষ্টতা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

হামদ ও সালাতের পর।

প্রিয় ভাইয়েরা নফস আপনাকে অনেক লম্বা চওড়া আশা দিবে। নফসের ধোঁকা থেকে কেউ বাঁচতে পারে নি আর কেউ বাচতে পারবেও না। কিন্তু কিয়ামতের দিন সব প্রকাশ হয়ে যাবে, এই জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চাইতে হবে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত বিষয়ে আঞ্জাম দেন। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।

মুসলমান তো দুনিয়ার কোনো পরোয়াই করা উচিৎ নয়, তাঁদের শুধু আখেরাতের ফিকির করা উচিৎ। আল্লাহ তায়ালা তো দুনিয়ার নিন্দা নিজে করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, (০.৫৯ সেকেন্ড)

ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًاۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍ

"যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে, আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা ভুল পথে দূরে পড়ে আছে।" (সূরা ইব্রাহিম,৩)

প্রিয় ভাইয়েরা এই আয়াতে যারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় তাঁদের কথা বলা হয়েছে। দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টা কেমন? যখন দুনিয়া ও আখিরাত দুটি বিষয় সাংঘর্ষিক হয় তখন তারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। এই কাজ সেই করতে পারে যার আখেরাতের উপর ঈমান নেই। যার আখেরাতের উপর ঈমান আছে সে কীভাবে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিবে? কারণ সে তো জানে দুনিয়া কিছুদিনের জন্য, একদিন আল্লাহর সামনে অবশ্যই দাড়াতে হবে, হিসাব দিতে হবে।

তাই যার আখিরাতের উপর ঈমান থাকবে সে এই দুনিয়াকে কখনই প্রাধান্য দিবে না। এই জন্য কুরআন ইমান বিল্লাহ ও ঈমান বিল আখিরাহ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে। সাধারণত কুরআন তো বিস্তারিত বর্ণনা করে। আল্লাহ সুবহানুতায়ালা কিছু জায়গায় ঈমানের বিষয় বিস্তারিত বলেছেন কিন্তু

অনেক জায়গায় শুধু এইদুটো বিষয় বলে শেষ করেছেন। যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং আখেরাতের উপর ঈমান আনে সে মুসলমান।

শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনার দাবি এটা তো কুফফাররাও করত মুনাফিকরাও এই কালিমা পড়তো। বাহ্যিকভাবে হুজুর সাঃ কে তারা মান্যও করত এবং একই সাথে ঈমানের বাহ্যিক শর্তগুলোও পূর্ণ করত। কিন্তু কার্যত তাঁদের আখেরাতের উপর ঈমান ছিল না। তারা অবশ্য আখেরাতকে স্বীকার করত কিন্তু আখেরাতের উপর ঈমান তো এমন বিষয় যেটা আমাল দ্বারা বুঝা যায়। উদাহরনসরূপ এক ব্যক্তি যে নামাজ আদায় করে আর মুখে আখিরাতকে স্বীকার করে তার তো কিছু না কিছু ফায়দা রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে যদি দেখা যায় সব বিষয়ে দুনিয়া আখিরাতের বিপরীতমুখী হলে সে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তাহলে বুঝা যাবে যে তাঁর আখিরাতের উপর ঈমান নেই।

দুই-একবার করলে সেইটা ভিন্ন কথা। কিন্তু যার সারাজীবন এমনভাবে কেটে যায় তাঁর ক্ষেত্রে এইটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যে সে আখিরাতের কোনো পরওয়াই করে না। সে আখিরাতকে কুরবান করতে চায়। তাই দুনিয়াকে সর্বদা প্রাধান্য দেয়।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা মানুষ যার উপর বিশ্বাস রাখে তার জন্য মেহনত করে। একটু লক্ষ্য করুন যে দুনিয়াদার পিতামাতারা তাঁদের বাচ্চাদেরকে তিন চার বছরেই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। গরমকাল বা শীতকালে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাতে হয় সকাল ছয়টায় অথবা সাতটায়। এই সকালেও বাচ্চাকে উঠিয়ে স্কুলে রওনা করিয়ে দেয়। বাচ্চার চোখ থেকে ঘুম যায় না এদিকে পড়ে যায় ঐদিকে পড়ে যায়, তবুও তাকে স্কুলে যেতেই হয়। মা বলেনা যে আজকে ওর ঘুম ভাঙেনি তাই আজ স্কুল থাকুক, আজকে স্কুলে যাওয়া লাগবে না। বরং জোর করে হলেও তাকে স্কুলে দিয়ে আসে।

এমনকি যদি সরকারের পক্ষ থেকে আদেশ আসে যে কাল থেকে স্কুল রাত দুইটায় শুরু হবে, তাহলেও তো মা-বাবারা সন্তানদেরকে স্কুলে দিয়ে আসবে। কারণ তারা এটার বিনিময় আসা করে।

যাদের টাকা পয়সার প্রয়োজন তারা চিন্তা করে যে বিশ-বাইশ বছর পর আমাদের এই সন্তান আমাদেকে টাকা কামাই করে দিবে আর যাদের টাকা-পয়সার দরকার নেই তারা সন্মানের আকাঙ্খী হয়। তারা চিন্তা করে আমার ছেলে এই হবে, সেই হবে। তাতে আমাদের নাম উজ্জ্বল হবে। আমাদের সুনাম সুখ্যাতি হবে।

তো খেয়াল করে দেখুন, এই বিষয়টি হবে পনের ষোল বছর পর আর মা-বাবারা ততদিন বেঁচে থাকবে কিনা? তাঁরও কোনো নিশ্চায়তা নেই। এইটাও জানা নেই যে বাচ্চা শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া করবে কীনা? এরপরও তারা তাদেরকে পড়ালেখা করায়, এই কারণেই যে তাঁদের দুনিয়ার উপর ঈমান আছে। কিন্তু যে বিষয়টা অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়টা এর চেয়েও বেশি একিনি তাঁর ব্যাপারে তাঁদের কোনো চেষ্টা প্রচেষ্টা নেই। দুনিয়ার এই বিষয়েতে শুধু একিনই না পড়বে কি পড়বে না তাঁর কোনো ঠিক নেই। তারপর মা-বাবার বাধ্যগত থাকবে কি থাকবে না তারও কোনো ভরসা নেই। তো যেই জিনিসের উপর একশ ভাগ বিশ্বাস নেই , তার জন্য এত চেষ্টা প্রচেষ্টা কেন? কারণ তাঁর(দুনিয়ার) উপর তাঁদের ঈমান আছে। অথচ আখিরাতের বিষয়ে পবিত্র কুরআন মাজিদে যা বলা হয়েছে তাঁর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।

যে ওয়াদা ও ভয় দেখানো হয়েছে তা তো হবেই হবে তবুও আখিরাত বিষয়ে তার কোনো চেষ্টা প্রচেষ্টা নেই। এইটা হলো একিনের পার্থক্য। তারা দুনিয়ার উপর একিন রাখে নাকি আখিরাতের উপর একিন রাখে তা তাদের আমাল দেখেই বুঝা যায়। যদি সে আখিরাতকে প্রাধান্য দেয় তাহলে বুঝতে হবে যে সে আখিরাতের উপর একিন রাখে। আর যদি দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তাহলে সে দুনিয়ার উপর একিন রাখে। আর ইয়াকিনি বিষয়ের জন্য তারা কেনইবা চেষ্টা করবে না? সাধারণত কোনো বিষয়ে আশা থাকলে মানুষ সেই বিষয়ে চেষ্টা করে।

কিন্তু যেইখানে দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয় এসে যায় আমরা সেইখানে দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিই। অথচ সাহাবাদের আমাল ছিল আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া আর দুনিয়া ছেড়ে দেওয়া। তারা আখিরাতের ক্ষেত্রে পিতা ছেলে থেকে ছেলে পিতা থেকে পিছনে পড়াকে সহ্য করতেন না। পুরুষরা মহিলাদের থেকে পিছনে থাকাকে সহ্য করতেন না। মহিলারা পুরুষদের থেকে পিছনে থাকাকে সহ্য করতেন না। সাহাবিদের একিন এমনই ছিল। এই জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে যেন আমরা ঐ

সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত না হয়ে যাই যারা দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। এইটাও কুফুরির একটা প্রকার যদিও এইক্ষেত্রে কুফরির ফতওয়া দেওয়া হবে না। খায়েশাতের পূজার দ্বারাও কুফুরির সৃষ্টি হয়। যেমন ইবনে আওন রাহিঃ এর একটি উক্তি থেকে বুঝা যায়, যেমন

তিনি বলেন,

"মুহাম্মদ বিন সিরিন রাহিঃ মনে করেন, *"সবথেকে দ্রুত মুরতাদ হয়ে যায় খায়েশাতের পূজারিরা, তাদের কাছে খায়েশাতঐ আসল হয়ে গিয়েছে।"* আর এইটাই তো মানুষের খায়েশাত বা নফসের চাহিদা। মানুষ যদি তার নফসের চাহিদা দমিয়ে না রাখে তবে শয়তান তার উপর সওয়ার হয়। সে খায়েশাতের গোলাম হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে খেয়াল খুশিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।" [সূরা আল জাসিয়া,২৩]

প্রিয় ভাইয়েরা, মাবুদ তো বলা তাকে যার প্রত্যেকটা কথা মানা হয়। যার কথা মানা জরুরি। তো মানুষ যদি এমন হয়ে যায়- যে তার মন যা চায় সে তাই পুরা করে। তাহলে সে নফসকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। এইটা তো হলো বৈধ বিষয়ে। আরেকটি হলো যা থেকে আল্লাহ ও তার রাসূল সাঃ নিষেধ করেছেন এর থেকেও বিরত থাকা জরুরি। দ্বীন এই বিষয়টিকে নিষেধ করে কিন্তু নফসের পূজারি ঐকাজটিই করে যায়। বাস্তবে তার আল্লাহ তায়ালাকে মা'বূদ বানানো উচিৎ ছিলো, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই মানা উচিৎ ছিলো।

আল্লাহ তায়ালা যে জিনিসের আদেশ করেছেন তা আদায় করা এবং যে বিষয়ে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা উচিৎ ছিল। কিন্তু এইক্ষেত্রে সে খায়েশাতকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছেন। তার মন যা চায় সে তাই করে। খায়েশাত যা বলে সে অনুযায়ী কাজ করে। অথচ শরীয়ত যা বলেছে তার সাথে তার কার্যাবলি সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ বিষয়টি এমন নয় যে এই বিষয়ে তার কোন এলেম

নেই। তারা খায়েশাতকে নিজেদের মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যে ভালো কাজের তৌফিক দিয়েছেন তার কোনো কদর করে নি। তাই তো আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

"আল্লাহ তায়ালা জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ঠ করেছেন।"

ফলে তারা নিজেদের খায়েশাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। এর পরিণতি খুবই খারাপ। এত খারাপ যে একটা পর্যায়ে এই খায়েশাত তাকে দ্বীন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। সে যেখানেই খায়েশাত আসে সেখানে তা গ্রহণ করে। এই জন্য দুনিয়ার মহব্বত খুব ভয়ানক বিষয়। এই বিষয়ে আমাদের আসলাফগণ অসংখ্য কিতাব লিখেছেন, অগণিত ওয়াজ নসিয়ত করেছেন।

দুনিয়ার মহব্বত ওলামাদের জন্য আরও খারাপ জিনিস। আলেমরা যদি দুনিয়ার দিকে নজর দেয় তাহলে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কত নিয়ামত দান করেছেন। 'ইলম এর নিয়ামত দান করেছেন, মা'রেফাত এর নেয়ামত দান করেছেন। এ 'ইলম থাকার পরও তারা দুনিদার হয়ে যাওয়া এইটা কোনো আলেমের ক্ষেত্রে হতে পারে না।

ইমাম গাজ্জালি রাহিঃ বলেন, *"কেউ যদি মনে করে যে সে দুনিয়াও কামাই করবে আর আখিরাতও কামাই করবে, তাহলে সে শয়তানের দোস্ত।"*

প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের এই জামানায় এসে এই মেজাজ বেশি তৈরি হয়ে গিয়েছে যে দুনিয়াও অর্জন করব আখিরাতও অর্জন করব। আমাদের আসলাফদের দিকেই দেখুন তারা সর্বদা আখিরাত কামাই করার ফিকির করেছেন। তারা দুনিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা যা মুবাহ করেছেন তা গ্রহণ করেছেন। এতটুকু গ্রহণ করেছেন যেন তারা ফেঁসে না যান। হারাম তো আছেই বরং সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকেও বেঁচে থাকতেন। দুনিয়াকে নিজেদের থেকে দূরে রাখতেন এবং নিজেকে দুনিয়া থেকে দূরে রাখতেন।

কিন্তু বর্তমানে তো হলো জাহিলিয়াতের ছড়াছড়ি। আলেমরা বলে দুনিয়াও ঠিক রাখো আখিরাতও ঠিক রাখো। আবার এইটা নিয়ে গর্বও করে। অথচ হাদিস শরীফে এসেছে - আল্লাহ তায়ালা যাকে

ভালোবাসেন তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচান যেমন তোমরা রুগীকে পানি থেকে বাঁচাও। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার কত খারাবি বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাঃ কত খারাবি বর্ণনা করেছেন। আকাবির-আসলাফগণ দুনিয়ার খারাবি বিষয়ে কত কিতাব লিখেছেন। আলেমদের তো দুনিয়ার কোনো পরওয়াই করা উচিৎ নয়, সর্বদা আখিরাতের ফিকির করা উচিৎ। দুনিয়ার জীবন তো কয়েকদিনের, দুনিয়ার স্বাদ, এইখানে থাকা আখিরাতের থাকার তুলনায় কয়েকদিন। আর যেই দিন চলে গেছে তার তো কোনো মজা নাই। শুধু স্মৃতি রয়েছে।

আর আরেকটা বিষয় হলো অন্যের বোঝা বহন করে চলা। এইটা কি ঠিক? যে অন্যের জন্য নিজের আখিরাতকে কুরবান করে দিবে? দুনিয়ার ক্ষতি তো কোনো ক্ষতিই না। আখিরাতের ক্ষতি অনেক বেশি যা গ্রহণ করা যায় না। আখিরাতে সবাইকে নিজের জবাব নিজেই দিতে হবে। সন্তানাদি সেদিন কোনো কাজে আসবে না। অন্যের কারনে আখিরাতকে ছেড়ে দেওয়া এটা আখিরাতের উপর ঈমান নয়। এটাইতো কামিয়াবি যে সে আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে আখিরাতের জন্য কাজ করবে। এটা ছাড়া জিন্দেগি নাকাম।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা একটু বলুনতো ঐ জীবনের কি মূল্য আছে যা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ছাড়া অতিবাহিত হয়। একজন ব্যাক্তি যত পদেরই অধিকারি হোক না কেন, যত টাকা পয়সাই তার থাকুক না কেন, আর যত সন্মানিতই হোক না কেন, মারা যাওয়ার সাথে সাথে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। আখিরাতে শুধু আমলই কাজে আসবে। মানুষ যে জিনিসকে চিনে বা জানে তা অর্জনের জন্য দামি দামি জিনিস ব্যয় করে। আর আল্লাহ তায়ালা যাকে যোগ্যতা দিয়েছেন সে সহজে ছাড়ে না, সে তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আখিরাতের বুঝ দান করেছেন এবং মা'রিফাত দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। তাই জান্নাতে আপনার থেকে কেউ যেন অগ্রসর না হয়ে যায় আমাদেরকে সর্বদা সেই ফিকির করতে হবে। আখিরাত তো এমন জিনিস যে তার জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিৎ। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মাজিদে বলেছেন,

خِتَٰمُهُۥ مِسۡكٞۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ

"আর আখিরাতের বিষয়ে প্রতিযোগিদের প্রতিযোগিতা করা উচিৎ" সূরা মুতাফফিফিন,২৬

প্রিয় ভাইয়েরা সাহাবীগণ তো জান্নাতের বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতেন। জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কেউ কারো থেকে পিছনে থাকাকে তারা সহ্য করতেন না। এই জন্য আমাদের আখিরাতের ফিকির করা উচিৎ। আল্লাহ তায়ালা জিহাদের বিষয়ে বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের কি এমন ব্যবসার বলব যা তোমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাচাবে?" সূরা আস সফ,১০

জিহাদের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাতের আজাব থেকে বাঁচাবেন, দুনিয়ার আজাব থেকেও বাঁচাবেন। যারা দুনিয়ার পিছনে দৌড়ায় তাদেরকে দেখুন দুনিয়া তাদেরকে কত অপমান করে। আরামে থাকলেও পেরেশান থাকে কিন্তু মুজাহিদ যারা দ্বীন এর কাজ করছেন তাদের কোনো পেরেশানি নেই। যদিও তাদের বিভিন্ন কষ্ট করতে হয়। তারপরেও তাদের কাউকে কখনও পেরেশান দেখা যায় না। সন্তানদের জন্য মানুষ কষ্ট করতে করতে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায়।

যেই জিনিসের জন্য মানুষ আল্লাহর নাফরমানি করে আল্লাহ তায়ালা তার উপর ঐ জিনিস চাপিয়ে দেন। যদি ব্যবসার জন্য আল্লাহর নাফরমানি করে অথবা সন্তানের জন্য করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা ঐ জিনিসকে তার উপর চাপিয়ে দিবেন এবং সব জিনিস আল্লাহতায়ালার হাতে। আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের সাথে একটি ভালো জিনিসের ওয়াদা করেছেন তাই এইক্ষেত্রে অন্য কিছুর পরওয়া করা উচিৎ নয়। আমাদের তো আখিরাতের জন্য এমন মেহনত করা উচিৎ যে একজন ব্যক্তি সামনে দৌড়ায় আর পিছনে দেখে না।

হুজুর সাঃ এর পর আজওয়াহে মুতাহারাগণ তো লম্বা সময় বেঁচে ছিলেন কিন্তু তারা কি দুনিয়ার দিকে ঝুকে পড়েছিলেন? অথচ রাসূল সাঃ এর সাথে তাদের জীবন কত কষ্টে কেটেছেন, দ্বীনের

পথে তো তারা অনেক অগ্রসর হয়েছিলেন। তারা কি এই চিন্তা করেছেন? যে আমাদের আখিরাত তো তৈরি আছেই তাই এখন একটু দুনিয়াতে আরাম করি।

প্রিয় ভাইয়েরা তারা রাসূল সাঃ এর সাথে কত না খেয়ে থেকেছেন। দুই মাস পর্যন্ত ঘরে চুলা জ্বলে নি। একবার আম্মাজান আয়েশা রাদিঃ কে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদিঃ এর আম্মাজান আশি হাজার দিরহাম হাদিয়া দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সকাল থেকে সন্ধার মধ্যে সব দিরহাম দান করে দিলেন। আম্মাজান সেইদিন রোজা ছিলেন সন্ধার সময় খাদেমাকে বললেন ইফতারির জন্য কিছু নিয়ে আসো। খাদেমা বলল ঘরে তো কিছুই নাই। আম্মাজান বললেন আগে বললে তো এক দিরহাম দিয়ে কিছু আনিয়ে নেওয়া যেত।

প্রিয় ভাইয়েরা লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রশস্ততা দান করেছিলেন তাদেরকে হালাল রিজিক দান করেছিলেন। তাদের মন এমন বানিয়েছিলেন যে তারা দুনিয়ার দিকে ঝুকে পড়তেন না। আমরা কি কুরআন হাদিস সাহাবাদের থেকে বেশি ভালো বুঝে গেছি? অথচ আমরা দলিল দিই

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"আর আপনার পালন কর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন" [সূরা আদ দুহা, ১১]

হাদিস শরিফে এসেছে, *আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের উপর প্রদত্ত নিয়ামত বর্ণনা করা পছন্দ করেন*। আমরা এইসব আয়াত ও হাদিসে ব্যাখ্যা করি যে ভালো ভালো জিনিস ব্যবহার করা, তাই সবথেকে দামি দামি পোশাক ব্যবহার করি। ভালো ভালো খাবার খাই, দামি দামি গাড়িতে ছড়ি। অথচ আজ কত মানুষ খাবার পায় না। কত মানুষ মেয়ের বিবাহ দিতে পারে না। অন্য দিকে কত মানুষ রেষ্ট্রুরেন্ট এ গিয়ে একদিনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ফেলে। এইটাই কি আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত নিয়ামত বর্ণনার চিত্র।

প্রিয় ভাইয়েরা একদিকে কিছু মানুষ আছে যারা খুব গরীব। তারা নিয়মিত খাবার খেতে পারে না, সংসার চালাতে পারে না, মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না, উপার্জন করার মত কেউ থাকে না, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পিতামাতা হয়ত আশি বা সত্তর বছরের বৃদ্ধ। এমন হালত জমিনের উপর

থাকার পরেও, দ্বীনদাররা উপরের আয়াত ও হাদিস দ্বারা নিজেদের পক্ষে দলীল পেশ করে। তাদের স্ত্রীদের দামি দামি অলংকার থাকে। আর তারা দলীল দেয় " وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ"।

আমি সেই সব ভাইদের বলব আপনারা কি এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি সাহাবিদের থেকে বেশি বুঝে গেছেন? হুজুর সাঃ এর সামনে সাহাবিদের জীবন কেমন অতিবাহিত হয়েছে? এবং হুজুর সাঃ এর পরে কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে? আল্লাহ তায়ালা সাহাবিদের প্রশস্থতা দান করেছেন। কিন্তু তাদের জীবন-যাপন আমাদের যুগের বিলাসি মানুষের মত ছিলো না। সমস্ত সাহাবিদের জীবনি মুতায়ালা করে দেখুন তারা কীভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন? ব্যপারটা এমন নয় যে মনে যা চায় তাই খেয়েছেন। মনে যা চেয়েছে তাই পরিধান করেছেন। তারপরও আপনি দ্বীনদার হয়ে গিয়েছেন।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা এখন তো মসজিদের মধ্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয় অথচ উম্মাত না খেয়ে থাকে। মহিলারা শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য হয়। এমতবস্থায় এইটা কীভাবে হতে পারে? যে মুসলমানরা বিলাসিতা করবে!! তাদের মসজিদগুলো আলিসান হবে!! আর তাদের মহিলারা রাস্তায় কাজ করতে বাধ্য হবে। এইটা কীভাবে সম্ভব?

প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারাই বলুন ঐ জাতিকে কীভাবে দ্বীনদার বলা যায়? যাদের মহিলারা রাস্তার ফুটপাতে ধাক্কা খেতে বাধ্য হয়! আর তাদের ভাইদের অন্তরে একটুও দয়া আসে না। তারা লাখ লাখ টাকা কোটি কোটি টাকা মসজিদ সজ্জায় লাগিয়ে দেয়। একবার হুজুর সাঃ এর চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিলো, যখন তিনি দেখেছিলেন সাহাবিরা মসজিদে ইট লাগাচ্ছে। প্রিয় ভাইয়েরা দ্বীন বুঝার জন্য একটু কষ্ট করতে হবে। আপনাদের কাছে দরখাস্ত হলো আপনারা এমন সময়ের দিকে তাকান যখন মানুষের মাঝে সমঝোতা ছিল। সে সকল মানুষদের জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ হওয়া উচিৎ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নফসের পূজা থেকে হেফাজত করুন।

কিয়ামতের দিন জাহান্নামিদের মধ্যে যারা সাধারণ মানুষ, তারা তাদের নেতাদেরকে বলবে "তোমরাই আমাদেরকে গোমরাহ বানিয়েছো। তোমরা এইদিক থেকে ঐদিক থেকে আসতে আর আমাদেরকে গোমরাহ করতে।" নেতারা বলবে, "আমরা তো তোমাদের উপর জোর খাটাই নি। বরং তোমরাই মুশরিক ছিলে।" এ কথার উদ্দেশ্য হলো তোমরা নফসের পূজারি ছিলে, এই কারণেই আজ তোমরা

জাহান্নামে। তোমাদেরকে আমরা কিছুতেই জোর করি নি। দুনিয়ার পিছনে পড়লে আখিরাতে অপমান আর দুনিয়াতেও অপমান। ইতিহাস উল্টালে দেখা যায় আলেমদের মধ্যে পূর্বেও দরবারি আলেম ছিল, ভালো আলেমও ছিলো। যারা দরবারি ছিল, তাদের পদ ছিল, তাদের বিলাসিতার উপকরন ছিল, তাদের সন্মান ছিল এবং তাদের অবস্থা আমাদের বর্তমানের কিছু আলেমদের মতও ছিলো। কিন্তু ইতিহাস কাদেরকে স্মরণ করে? দরবারি লোকদের কথা কেউ কখনো স্মরণ রাখে না।

খোদ আবু হানিফা রাহিঃ এর বিপরীতে কত আলেমরা ছিল তাদেরকে কতজন চিনে? আবু হানিফা রাহিঃ এর বিরুদ্ধে ছিলো শাসক। আর আপনারা তো ভালো করেই জানেন, যার উপর শাসক নাখোশ থাকে তার পরিণতি কি করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কাকে ভালোবেসেছেন? আসমানওয়ালা কাকে মহব্বত করেছেন? পুরো ইতিহাস এমন ঘটনা দ্বারা ভরপুর। যে আল্লাহ তায়ালার হয়ে যাবে আল্লাহ তায়ালা তার হয়ে যাবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আখিরাতের বান্দা বানান এবং আমাদেরকে কুরআনের হক আদায়কারি বানান।

প্রিয় ভাইয়েরা দুনিয়ার মহব্বত অনেক খারাপ জিনিস। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

"আর যাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল,তারা সে তাওরাতের উপর আমল করে নি, তাওরাতের হক আদায় করে নি। তাদের উদাহরণ হলো ঐ গাধার মত যে কিতাবের বোঝা বহন করে" [সূরা আল জুমুআহ,৫]

অর্থাৎ এই আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা তাওরাতের হক আদায় করে নি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুরআনের হক আদায়কারী বানিয়ে দিন। আর আমাদের যে পেরেশানি আছে এইটাতো যাহেরি পেরেশানি। আল্লাহ তায়ালা এই পেরেশানি থেকে সহজে মুক্তি দান করবেন। বাহ্যিকভাবে এই পেরেশানি অনেক বড় মনে হলেও আল্লাহতায়ালা আসান করে দেন। দুনিয়ার বিপদ তো সাধারণ বিপদ। ইব্রাহিম আঃ কে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সেটাকে শান্তির জায়গা বানিয়ে দিয়েছিলেন।

জিহাদের ক্ষেত্রে যত সমস্যা বা বাধা দেখা যায় সব বাহ্যিকভাবে দেখা যায় আসলে কাছে থেকে দেখলে বেশি কষ্ট মনে হয় না, আল্লাহ তায়ালা আসান করে দেন। পক্ষান্তরে যারা এর বিপরীত

তাদেরকে দেখা যায় তারা অনেক শান্তি ও আরামে আছে কিন্তু তারা অনেক কষ্টে আছে। বাহ্যিকভাবে তারা অনেক আরামে থাকে। ঠান্ডা রুম, নরম বিছানা, আরোও কত বিলাসিতা কিন্তু বাস্তবে তারা মানসিক শান্তি পায় না। অন্যদিকে মুজাহিদরা উচু নিচু পাথরের ভূমিতে উপর চাদর বিছিয়ে ঘুমায় অথচ তাদের কোনো পেরেশানি নেই। আল্লাহ তায়ালাই তাছির পয়দা করে দেন। যে আল্লাহ তায়ালার হয়ে যাবে সে শান্তিতে থাকবে। দুনিয়াতেও তার শান্তি আখিরাতেও তার শান্তি। আর যে আল্লাহ তায়ালার হবে না সে কোনো শান্তিই পাবে না, না দুনিয়াতে না আখিরাতে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিজের বানিয়ে নেন এবং আখিরাতের বান্দা বানান।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমিন ইয়া রব্বাল 'আলামিন।